বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু : সমাজ প্রভাবিত প্রজ্ঞানমূলক আচরণ বিশ্লেষণ

নাদিয়া নন্দিতা ইসলাম*

সারসংক্ষেপ

অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু (nonverbal cultural taboo) এমন এক ধরনের বিশ্বাস এবং অভ্যাস যা যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক ধারণা দ্বারা বর্ণনা বা ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। দীর্ঘদিন ধরে মানুষ তার সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবিত বিশ্বাস বহন করে চলে, যার বহিঃপ্রকাশে সমাজের মানুষের আচরণিক ধ্যান ধারণারও পরিচয় ফুটে ওঠে। অর্থাৎ এটি পালনের অভ্যাস বা ধারণা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং ভয়কে প্রতিফলিত করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিচিত্র অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুর ধারণা বহুকাল ধরে মানুষের মধ্যে পরিচিত এবং বিদ্যমান রয়েছে। যদিও বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভাবিত সমাজে শিক্ষাবিস্তারের কারণে মানুষের মাঝে সাংস্কৃতিক ট্যাবু প্ররোচিত ধারণার প্রভাব কমে গেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নারী বিষয়ক অভাষিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুর সমাজ প্রভাবিত প্রজ্ঞানমূলক (cognation) প্রকৃতির আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চাবি শব্দ: অবাচনিক ভাষিক উপাদান, সাংস্কৃতিক ট্যাবু, নারী ও সমাজ, প্রজ্ঞানমূলক আচরণ।

১. ভূমিকা

সমাজে জীবনাচরণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সমাজ এবং সংস্কৃতি প্রভাবিত বিভিন্ন আদেশ, বিধি, রীতি-নীতি, নৈতিক মূল্যবোধ, নিষেধ রয়েছে যা সাংস্কৃতিক ট্যাবু (cultural taboo) নামে পরিচিত। সাংস্কৃতিক ট্যাবু পালনে বিশ্বাস, অভ্যাস বা এর প্রতি আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে মূলত মানব মনে জন্ম নেয়া অজানা ভয়, অনিশ্চয়তা বা বিশেষ পরিবেশ-উদ্ভূত নেতিবাচক বিভিন্ন মানসিক উপাদান থেকে। প্রায় প্রতিটি মানব সমাজে সাংস্কৃতিক ট্যাবু ধারণা বিদ্যমান যদিও এর কোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক ব্যখ্যা অথবা গ্রহণযোগ্যতা নেই। পরিবেশ, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন, শিক্ষার স্তরের ভিন্নতার কারণে এর ব্যবহারিক রূপ একেক সামাজিক প্রতিবেশে একেক রকম। একে অপরের সাথে সংজ্ঞাপনের (communication) লক্ষ্যে ভাষিক বা অবাচনিক উপস্থাপনের মাধ্যমে সমাজ প্রভাবিত বিধি অনুযায়ী ব্যক্তির আচরণ প্রকাশ পায়। পৃথিবীর প্রায় সবকটি সামাজিক পরিবেশে কমবশি অভাষিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুর বিচিত্র রূপ দেখতে পাওয়া যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশে প্রচলিত নারী সংক্রান্ত বৈচিত্র্যময় অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুর সমাজ প্রভাবিত প্রজ্ঞানমূলক প্রকৃতির স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে।

২.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

আমাদের দেশে আবহমান কাল ধরে মানুষের চিন্তায় ও অভ্যাসে নারী বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ট্যাবুর ধারণা দেখতে পাওয়া যায়। কালের বিবর্তনে এ অঞ্চলের মানুষের বিভিন্ন

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ধরনের সাংস্কৃতিক ট্যাবুর ধারণা বদল হয়েছে। তবুও সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গ্রামীণ জনসাধারণ এবং শিক্ষার আলো বঞ্চিত মানুষের কাছে এ ধরনের ট্যাবুর গ্রহণযোগ্যতা দেখতে পাওয়া যায়। পূর্বে বাংলাদেশের প্রতিবেশে সাংস্কৃতিক ট্যাবু সংক্রান্ত কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়নি। এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য হলো বাংলা অঞ্চলের প্রচলিত সমাজ প্রভাবিত নারী সংক্রান্ত অভাষিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুর প্রজ্ঞানমূলক আচরণের প্রকৃতি অনুসন্ধান এবং তা বিশ্লেষণ করা। পাশাপাশি উপস্থাপিত বৈচিত্র্যময় অভাষিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুগুলো এ অঞ্চলে আবহমানকাল ধরে নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিরও একটি পরিচয় তুলে ধরছে।

২.২ গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে, গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে গুণগত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স শ্রেণিতে অধ্যায়নরত ৩০ জন নারী শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৫০টি উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত এসকল শিক্ষার্থীর জন্মস্থানে (গ্রামে বা শহরে) নারীকেন্দ্রিক প্রচলিত অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু তথ্য-উপাত্তের প্রাথমিক নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। উল্লেখ করা যায় যে, নারী শিক্ষার্থীগণ ছোটবেলা থেকে বড় হয়ে ওঠা অব্দি সময়ে তাদের মাতৃস্থানীয় নারীদের কাছ থেকে প্রভাবিত হয়ে সমাজে প্রচলিত এসব অভাষিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুরদ্বারা অবচেতন ভাবেই আচরণগত দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে সমাজভাষাবিজ্ঞান, প্রজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক ট্যাবু সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং গবেষণা পত্রের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

৩. সাংস্কৃতিক ট্যাবু

আবদুল হাইয়ের মতে ট্যাবু, ''সামাজিক বাধা নিষেধ (taboo) রুচি ও স্থান কাল পাত্র ভেদে প্রত্যেক সমাজেই আছে। সমাজ ও ভাষাভেদে এ বাধানিষেধগুলোর এক একটা ব্যবহারিক নাম আছে''।[১] সাধারণত সামাজিক জীবনে, সমাজের মানুষদের আচরণ এবং জীবনাচরণ নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবিত বিধি নিষেধগুলো পরবর্তী সময়ে সাংস্কৃতিক ট্যাবুর রূপ লাভ করে। সমাজের বিভিন্ন আদর্শ, আদেশ, রীতি নীতি, নিষেধাজ্ঞাকে নৈতিক মূল্যবোধ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পূর্বের আদর্শ এবং মূল্যবোধ দ্বারা সামাজিক বিচ্যুতি এড়াতে সমাজের মানুষের প্রতি ইতিবাচক নির্দেশিকা হিসেবে এ জাতীয় রীতি পালন কাজ করে বলে ধারণা করা হতো।[২] আমাদের সমাজে প্রচলিত ভাষিক ও অভাষিক আচরণগুলো সমাজ ব্যবস্থা, রীতিনীতি, সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত। এ জাতীয় রীতি পালনের বাস্তবিক কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তারপরও প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সমাজে এ জাতীয় ট্যাবুর প্রচলন দেখা যায়। কালের বিবর্তনে মানুষের বিশ্বাস বা কর্মে এ ধারণাগুলোর প্রভাব না থাকলেও জীবনের বহু ক্ষেত্রে সমাজে কুসংস্কারের রূপে এ রীতি, ধ্যান ধারণার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।[৩]

৩.১ অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু

একে অপরের সাথে ভাষিক যোগাযোগ সংগঠনে সচেতন এবং অবচেতন মনে ভাব আদান প্রদানে ভাষিক উপাদানের পাশাপাশি অবাচনিক ভাষিক উপাদানের ব্যবহার সংজ্ঞাপনকে আরো অর্থময়,

সহজ এবং বোধগম্যযোগ্য করে তোলে।[৪] মুখের ভাষা ব্যবহার করে নয় অর্থাৎ অভাষিক উপস্থাপনের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর সমাজ সংস্কৃতি প্রভাবিত ইতিবাচক বা নেতিবাচক ধারণার ভিত্তিতে রীতি-নীতি পালনই অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু। অবাচনিক ধারণাগুলো সাধারণত রূপকার্থে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। জন্মের পর থেকেই ব্যক্তি তার সামাজিক পরিবেশ থেকে বাচনিক উপাদানের পাশাপাশি অবাচনিক উপাদানগুলো আত্মস্থ করে নেন এবং পরে যা অবচেতন মনে অভ্যাসের রূপ লাভ করে থাকে। অভাষিক উপাদানে রূপকের উপস্থিতি দৃশ্যমান থাকে এবং প্রতিবেশ অনুযায়ী ব্যক্তি সেই রূপকের অর্থকে ব্যাখ্যা করে নেন।[৫] অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুর ক্ষেত্রেও ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা এবং প্রতিবেশ অনুযায়ী আচরণ এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকেন। ব্যক্তির মনে তার আশেপাশের বিভিন্ন মানুষের ইতিবাচক বা নেতিবাচক বাচনিক এবং অবাচনিক আচরণে অনুপ্রাণনা বা অনাগ্রহের জন্ম নেয়।[৬] সাংস্কৃতিক ট্যাবু প্রভাবিত রীতি পালনের ধারণা বা অর্থ বিচারের বৈজ্ঞানিক কোনো ব্যাখ্যা নেই। এ জাতীয় রীতি যা মূলত একই এলাকার এক প্রজন্মের মানুষের কাছ থেকে অন্য প্রজন্মের মানুষ আত্মস্থ করে থাকে। ব্যক্তি যে সমাজে বেড়ে উঠেছে সেই সমাজের রীতিনীতি, ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস, বেড়ে ওঠার সঙ্গ এবং প্রতিবেশ তার আচরণে সব থেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারে।[৭] আমাদের দেশের প্রতিবেশে বড়দের প্রতি সম্মানার্থে বিভিন্ন অবাচনিক আচরণ রীতি ছোটদের পালন করতে দেখা যায়। এর মধ্যে বড়দের দেখে উঠে দাঁড়ানো, হাতের ইশারায় না ডেকে কাছে গিয়ে ডাকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পুরুষের ক্ষেত্রে নারীকে সম্মানার্থে দরজা খুলে দেয়া, যাত্রা পথে তাকে আগে যাবার সুযোগ করে দেয়া বা নারীদের দেখলে বসার স্থান ছেড়ে তাকে বসতে দেয়া বা উঠে দাঁড়ানো জাতীয় আচরণিক রীতি ব্রিটিশ সংস্কৃতির দান।[৮] অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবিত বিভিন্ন অবাচনিক আচরণিক রীতির প্রচলন দেখা যায়।

৩.২ সাংস্কৃতিক ট্যাবু দ্বারা প্রভাবিত হবার কারণ

একেকটি সমাজের সংস্কৃতি সেই সমাজের মানুষের আচরণিক অভ্যাস, চিন্তা, চেতনা, নারীর প্রতি সহনশীলতা তথা সমাজের বিভিন্ন প্রথা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন। প্রতিটি সংস্কৃতিতে যাপিত মানুষের একে অপরের সাথে প্রকাশিত আচরণিক বৈচিত্র্য সেই সমাজের সামাজিক মূল্যবোধকেও তুলে ধরে। প্রতিটি সমাজে ট্যাবুর ধারণা সাধারণত সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, প্রাকৃতিক, আঞ্চলিক প্রভৃতি বিষয়ের দ্বারা মানুষের মনে প্রভাব সৃষ্টি করে। সেইসব ধারণা পরবর্তীতে মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে থাকে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের বিশ্বাস, চিন্তা, চেতনা, ধারণা, অভ্যাস এবং আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।[৯] কালের বিবর্তনে শিক্ষা, বিশ্বায়নের ফলে সাংস্কৃতিক ধারণাগত পরিবর্তনে মানুষের চিন্তা চেতনা, অভ্যাস ও আচরণেরও বৈচিত্র্য বা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। মানুষ পুরনো অভ্যাস, চিন্তার পরিবর্তে নতুন করে বিভিন্ন ধারণাকে গ্রহণ করতে শেখে।[১০]

চারপাশে যা ঘটছে তা সম্পর্কে ছোট থেকে সমাজ প্রভাবিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ভবিষ্যতের জন্যে সচেতন হতে শেখায় এবং ব্যাখ্যাযোগ্য নয় এমন বিষয়ের প্রতি মানুষ আশ্রয় খোঁজে। ব্যক্তি মনে

করেন, যেকোনো খারাপ পরিণতি থেকে নিষেধ নীতিরীতি পালন তাকে নিরাপদ রাখবে।[১১] সামাজিক মূল্যবোধের অংশ হিসেবে ছোটবেলা থেকেই মানুষের মনে সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবিত ধারণা, রীতিনীতি পালন করার স্পৃহা জন্মে।[১২] জন্মের পর থেকে এ সকল রীতি বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা মূলত নির্ভর করে সমাজে বসবাসরত তার আশপাশের মানুষজনের আচরণের ওপর। পরবর্তীতে ব্যক্তি বেড়ে ওঠার সময় তার নিজস্ব বিশ্বাস, ধারণাকে মূল্যায়ন করতে শেখে এবং তার অভ্যাসেও এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।[১৩] অনেক সময় ব্যক্তি মনে করেন, রীতিনীতি মেনে চললে ভবিষ্যতের নেতিবাচক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ব্যক্তি মানসিক ভাবে আত্মস্থ করে থাকেন যে, বেশিরভাগ রীতিনীতি পালন তা বাচনিক বা অবাচনিক যেকোনো রূপেই হতে পারে সমস্যা সমাধানের একটি চর্চা। এই চর্চা নেতিবাচক বিষয় থেকে রক্ষা করে ইতিবাচক ভবিষ্যতের সুরক্ষা দান করে।[১৪]

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং রীতিনীতি, একটি সম্প্রদায়ের পরিচয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ গঠন করে। সংস্কৃতি প্রভাবিত ট্যাবু বিশ্বাস এবং অনুশীলন মানব মনে গভীরভাবে প্রোথিত থাকে। উপরন্তু, সমাজে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির এ জাতীয় ট্যাবুর প্রতি আচরণ (আস্থা বা অনাস্থা) সাধারণ মানুষের এর প্রতি ইতিবাচক বা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কোনো ধারণার প্রতি বিশ্বাস সাধারণত একটি প্রজন্ম থেকে আরেকটি প্রজন্মের মধ্যে বহমান থাকে। একটি নির্দিষ্ট সমাজের নৈতিক বিশ্বাস (moral codes) কালের বিবর্তনে অভ্যাসে রূপ নিতে পারে। যুগে যুগে কোনো একটি রীতির বা বিষয়ের অর্থের ধারণাও বদলে যেতে পারে এর মূল কারণ হলো বিশ্বায়ন।[১৫] বর্তমানে প্রযুক্তির ব্যবহার, শিক্ষার মানের অগ্রসরতা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসার এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রাচীন অনেক রীতিনীতি, ধ্যান ধারণা থেকে মানুষ বের হয়ে আসছে। প্রকৃতি বা পরিবেশগত ধারণা সম্পর্কে আমাদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞান সীমিত ছিল। এই রীতি বিশ্বাস তাদের জীবনাচরণের জন্যে সহজ ছিল, কারণ অনেক কিছুই তাদের অজানা ছিল। অজানা বিষয়ে একধরনের ভয় কাজ করেছে এবং তাদের জন্যে সহজে সবকিছু যুক্তি দিয়ে বুঝবার মতন পরিবেশ ছিল না।[১৬] তারা পরিবেশ থেকে প্রাপ্তজ্ঞান দিয়ে কালক্রমে অনুধাবন করতে শিখেছেন কোনটি বিশ্বাস করা যায় বা কোনটির বিশ্বাসযোগ্য কোনো ভিত্তি নেই। যুগের বিবর্তনে বিভিন্ন পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত নানা ইতিবাচক ধারণা থেকে নেতিবাচক ধারণার প্রতি বিশ্বাসের প্রবণতা কমেছে।

৪. সামাজিক প্রজ্ঞানমূলক (cognition) ধারণায় সাংস্কৃতিক ট্যাবু

সামাজিক প্রজ্ঞানমূলক (Social cognitive) ধারণাটি Albert Bandura **১৯৮৬** সালে প্রথম উপস্থাপন করেন।[১৭] প্রজ্ঞান হলো চিন্তা, মনোযোগ, শিক্ষণ, স্মৃতি এবং উপলব্ধিসহ মস্তিষ্কে সংঘটিত মানসিক প্রক্রিয়া। সমাজে বসবারসত মানুষের মানসিক প্রকৃতি বুঝে আচরণ সংঘটন সামাজিক সজ্ঞাপন সফল করে। সামাজিক প্রজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ সমাজ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ধারণা, রীতিনীতি, আদেশ নিষেধ সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী যথাযথভাবে আচরণ করতে সক্ষম হয়।[১৮] মানুষ ছোটবেলা থেকেই বেড়ে ওঠার পরিবেশ দ্বারা

প্রভাবিত হয়ে তার পারিপার্শ্বিক বিষয়ে চিন্তা, বিশ্বাস ও ধারণা লাভ করে থাকে। কালক্রমে এ ধারণাগুলো অভ্যাসে রূপান্তরিত হয়।[১৯] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাঙালি সমাজের প্রতিবেশে বসে থাকা অবস্থায় বড়দের দেখলে উঠে দাঁড়ানো, তাদের সামনে পায়ের ওপর পা তুলে না-বসা, হাতের ইশারায় না-ডাকা, চোখে চোখ রেখে কথা না বলা (সম্মানার্থে), গায়ে পা লেগে গেলে তাকে ছুঁয়ে সালাম করার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতির প্রচলন রয়েছে। এ জাতীয় রীতির ধারণা শিশু তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে এ রীতি পালন তার আচরণে প্রকাশ পায়। সাধারণত অভ্যাস মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলের কার্যকারিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রবৃত্তির (instincts) মতো কাজ করে। অভ্যাস আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাচনিক বা অবাচনিক ভাষা ব্যবহারে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের ভাষিক আচরণকে প্রভাবিত করে।[২০] ব্যক্তির ইতিবাচক বা নেতিবাচক যেকোনো ধরনের অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে, যা সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিভিন্ন বিষয়ে তার পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ ও মানুষের আচরণের ওপর।[২১]

সমাজের মানুষের আচরণ ও সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রীতি থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।[২২] মানুষ বেড়ে ওঠার সাথে সাথে নতুন ভাবে চিন্তা করতে শেখে, পাশাপাশি তার অভ্যাসের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।[২৩] সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা, রীতিনীতি, ধারণার প্রতি বিশ্বাস বা অবিশ্বাস সে নিজের মতন করে প্রকাশ করে থাকে। কোনো একটি বিষয়ের ওপর মস্তিষ্কে বহু বছর ধরে গড়ে ওঠা ধারণা পরিবর্তন করতে সময় লেগে যায়। তবে অভিজ্ঞতা অর্জনের সাথে সাথে ব্যক্তি তার চিন্তা, বিশ্বাসকে নতুন করেও অভ্যাসে পরিণত করতে সমর্থ হয়।[২৪] সাংস্কৃতিক ট্যাবু বিষয়ক ধারণা প্রজ্ঞানমূলক (cognitive) এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচরণ ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায়। সাধারণত এ জাতীয় ট্যাবু ধারণা লালন এবং এর প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির দুটি লক্ষ্য অর্জনের চিন্তা কাজ করে, একটি হলো সৌভাগ্য অর্জন করা, আরেকটি হলো দুর্ভাগ্য এড়ানোর চেষ্টা। উদাহরণস্বরূপ (প্রবন্ধে উপস্থাপিত উপাত্ত: ১৩ ও ১৪) বলা যায়, স্বামীর মঙ্গলার্থে সনাতনধর্মে বিশ্বাসী বিবাহিত নারী শাঁখা সিঁদুর পরিধান করেন আবার দুর্ভাগ্য এড়ানোর চেষ্টা হিসেবে সন্তানসম্ভবা নারীর হাঁস মুরগি জবাই করা নিষিদ্ধ যাতে তার সন্তান জন্মের সময় ঠোঁট কাটা না হয়। সাংস্কৃতিক ট্যাবু প্রতিটি সমাজেই মানুষের মাঝে প্রচলিত। একেক সমাজ-সংস্কৃতিতে একেক ধরনের রীতিনীতি, বিশ্বাস গুরুত্ব পায়। সমাজ ও প্রকৃতি থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করে ব্যক্তি তার আচরণ প্রকাশ এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এর ফলে সাংস্কৃতিক ট্যাবু ধারণা এবং এর রীতি পালনও কালপরম্পরায় এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রসারিত হয়। সামাজিক প্রজ্ঞানমূলক (cognition) ধারণা অনুযায়ী মানুষ ছোট থেকেই তার চারপাশের পরিবেশ হতে অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং প্রতিবেশ অনুযায়ী তার আচরণে সমাজ প্রভাবিত চিন্তা, রীতিনীতি, আদেশ নিষেধ প্রকাশ পায়। ভাষিক ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি তার আচরণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকেই উপস্থাপন করে থাকেন।[২৫] সাংস্কৃতিক ট্যাবু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থারই একটি বৈচিত্র্যময় বহিঃপ্রকাশ। ব্যক্তি তার পরিবেশ থেকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় বিভিন্ন বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত তথ্য লাভ করেন এবং ইতিবাচক বা নেতিবাচক ধারণাপুষ্ট হয়ে নিজের মতন করে আচরণ করেন।[২৬] কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে

ইতিবাচক বা নেতিবাচক মনোভাব কিংবা কোন পরিবেশে কী ধরনের আচরণ করবেন তা পূর্বঅভিজ্ঞতা কেমন ছিল তার ভিত্তিতে নির্ভর করে।[২৭]

৫. নারী বিষয়ক অভাষিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুর উপাত্তের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

৫.১ প্রাপ্ত উপাত্ত উপস্থাপন

বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত উপাত্তগুলো কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, যথাঃ অবিবাহিত নারী-বিষয়ক সাংস্কৃতিক ট্যাবু (১-৪), বিবাহিত নারী-বিষয়ক সাংস্কৃতিক ট্যাবু (৫-১৩), সন্তানসম্ভবা নারী-বিষয়ক সাংস্কৃতিক ট্যাবু (১৪-১৭), নিঃসন্তান নারী-বিষয়ক সাংস্কৃতিক ট্যাবু (১৮), বিধবা নারী-সংক্রান্ত সাংস্কৃতিক ট্যাবু (১৯), সকল বয়সী নারী-বিষয়ক সাংস্কৃতিক ট্যাবু (২০-২৮), গৃহস্থালি ও প্রতিবেশ নির্ভর কাজের ক্ষেত্রে নারী-সংক্রান্ত সাংস্কৃতিক ট্যাবু (২৯-৫০) প্রভৃতি। এখানে সারণির মাধ্যমে উপাত্তগুলো উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ৫.১: বাংলাদেশের প্রতিবেশে প্রচলিত নারী বিষয়ক সাংস্কৃতিক ট্যাবু

বিভিন্ন রূপে নারী	প্রচলিত নারী বিষয়ক সাংস্কৃতিক ট্যাবু
অবিবাহিত নারী	১। রাতের বেলা আয়না দেখলে দেরিতে বিয়ে হবে।
	২। ছোট বেলায় কুমারী মেয়ে খুন্তির বাড়ি খেলে সে বন্ধ্যা হয়ে যাবে।
	৩। রান্না করা হাঁস-মুরগির পেটের ডিম অবিবাহিত মেয়ে খেলে সে বন্ধ্যা হয়ে যাবে।
	৪। প্রথম পিঠা অবিবাহিত মেয়ে খেতে পারবে না, তাহলে মেয়ে সন্তান প্রসব করবে।
বিবাহিত নারী	৫। বিবাহিত মেয়েদের নাকে নাকফুল এবং হাতে চুরি না পরলে স্বামীর অমঙ্গল হয়।
	৬। এক বিছানার চাদর দুজন মিলে ধরলে ঘরে সতীন আসে।
	৭। আঁচড়ানো চুল আবার আঁচড়ালে সতীন আসে।
	৮। সবার খাওয়া শেষ না হলে খেতে বসলে সংসারের অমঙ্গল হবে।
	৯। বিবাহিত মহিলাদের নতুন কাপড় পরে পেছনে তাকালে স্বামীর অমঙ্গল হয়।
	১০। নাক ফুল হারিয়ে গেলে স্বামীর বিপদ হয়।
	১১। খাবার পরে বাসন চেটে খেলে মেয়ে হয়।
	১২। একমাত্র পুত্রের মা রাতে বাঁশির আওয়াজ শুনলে সেদিন আর কোনো খাবার গ্রহণ করতে পারেন না।
	১৩। সনাতন ধর্ম অনুযায়ী শাঁখা সিঁদুর না পরলে স্বামীর অমঙ্গল হয়।
সন্তানসম্ভবা নারী	১৪। গর্ভবতী নারীর হাঁস মুরগি জবাই করা যাবে না, তাহলে বাচ্চা ঠোঁট কাটা হয়।
	১৫। চন্দ্রগ্রহণের সময় সন্তানসম্ভবা নারীর বটি, দা, ছুরির কাজ করা যাবে না।
	১৬। চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সময় গর্ভবতী নারীর খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না।
	১৭। দুপুর, সন্ধ্যা বা মাঝরাতে ঘর থেকে বের হলে লোহা, আগুন জাতীয় দ্রব্য সাথে রাখতে বলা হয়।
নিঃসন্তান নারী	১৮। নিঃসন্তান বা বন্ধ্যা কারো মুখ দেখে বের হলে অমঙ্গল হয়।
বিধবা নারী	১৯। বিয়ের অনুষ্ঠানে কোনো বিধবা উপস্থিত থাকলে নব দম্পতির অমঙ্গল হবে।

সব বয়সী নারী	২০। বাঁশ গাছের নিচে চুল রেখে দিলে তা বাঁশের মতন লম্বা হবে।
	২১। কোনো নারী হাঁড়িতে ভাত খেলে মেয়ে সন্তান প্রসব করবে।
	২২। জোড়া কলা খাওয়া যাবে না, এতে বিয়ের পরে জমজ শিশুর জন্ম হবে।
	২৩। মেয়েদের জোরে কথা বললে সংসারে অশান্তি হবে।
	২৪। মেয়েরা হাঁড়ির প্রথম ভাত বা পিঠা খেলে বন্ধ্যা হয়।
	২৫। মেয়েরা জোরে হাঁটলে বা হাসলে সংসারে অশান্তি, বিপদ আসে।
	২৬। ভাঙ্গা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ালে অল্প বয়সে বিধবা হয়।
	২৭। আজানের সময় মাথায় কাপড় না দিলে শয়তান প্রস্রাব করে দেয়।
	২৮। অবিবাহিত এবং বিবাহিত মেয়েদের সাদা শাড়ি পরা যাবে না।
নারীর দায়িত্ব পালনে	২৯। বাচ্চার কান ফুঁড়িয়ে খুঁত করে দিলে যম আসে না।
	৩০। বাচ্চাদের শরীরে লোহা (তাবিজ বা ধাতু) রাখতে হবে নইলে খারাপ নজর পড়বে।
	৩১। ছোট শিশুদের কপালে কালো টিপ পরালে নজর লাগবে না।
	৩২। সকালবেলা ঘর, উঠান ঝাড়ু না দিলে অমঙ্গল হবে মনে করা হয়।
	৩৩। সকালবেলা রাতের বাসি কাপড় বদলে দিন শুরু করতে হবে।
	৩৪। সকালে না খেয়ে বা খালি পেটে বাসা থেকে বের হওয়া অমঙ্গল।
	৩৫। দুপুরের সময় ভিক্ষা দিলে ঘরে খাদ্য ঘাটতি ঘটে।
	৩৬। সন্ধ্যাবেলা চুল খোলা রেখে বাইরে যাওয়া যাবে না।
	৩৭। সন্ধ্যায় বা খালি ঘরে বাতি না জ্বালানোকে অমঙ্গল হিসেবে ধরা হয়।
	৩৮। রাতে ঝাড়ু দেওয়া যাবে না এবং ময়লা ফেলা হলে ঘরে অশুভ দৃষ্টি পড়ে।
	৩৯। রাতের বেলা ময়লা পানি বাইরে ফেলা যাবে না, তাহলে ঘরে খারাপ দৃষ্টি পড়ে।
	৪০। ভেজা কাপড় সন্ধ্যার আগেই ঘরে তুলতে হবে নইলে খারাপ বাতাস লাগবে।
	৪১। কপালে হাত দিয়ে বসলে ভাগ্যে খারাপ লেখা হয়।
	৪২। ঝাড়ু গায়ে লাগলে লক্ষ্মী চলে যায়।
	৪৩। কেউ পানি চাইলে শুধু পানি খেতে দেওয়া যাবে না নইলে ঘরে অলক্ষ্মী প্রবেশ করবে।
	৪৪। কাউকে এক লোকমা ভাত দেয়া যাবে না তাহলে সে পানিতে পড়বে।
	৪৫। কেউ খাবার দিলে তাকে খালি বাটি ফেরত দেয়া যাবে না। এত গৃহস্থ ঘরের লক্ষ্মী চলে যাবে।
	৪৬। খালি মুখে মেহমানকে বিদায় দিলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।
	৪৭। বিয়ে বাড়িতে কালো রঙের পোশাক পরিধান করা অমঙ্গল।
	৪৮। নতুন কাপড়ে আগুনের ছ্যাঁকা নিয়ে পরিধান করতে হবে নইলে খারাপ নজর লাগবে।
	৪৯। রাতে কাউকে সুঁই-সুতা বা হলুদ ধার দেয়া যাবে না।
	৫০। গেঞ্জি গামছা সেলাই করে পরলে বা জামা পরে থাকা অবস্থায় সেলাই করলে গরিব হয়ে যায়।

৫.২ প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ

একটি সমাজের প্রচলিত সাংস্কৃতিক রীতি পালনের ধারণা থেকে সেই সমাজের মানুষের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, নারীর প্রতি আচরণ সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যায়। প্রবন্ধে উপস্থাপিত উপাত্তে, বাংলাদেশের প্রতিবেশে প্রচলিত এসব সাংস্কৃতিক ট্যাবুর মাধ্যমে নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কেও সামগ্রিক একটি ধারণা পাওয়া যায়।

ক) সামগ্রিক ক্ষেত্রে নারীর সব ধরনের আচরণের প্রতি কিছু আদেশ-নিষেধ, নির্দেশ লক্ষ করা যায়, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ছোট থেকেই নারীকে তার আচরণ সংযত করার শিক্ষা দেওয়া হয়, যেমন– (উপাত্তঃ ২৩, ২৫, ৪১) জোরে হাসা, কথা বলা বা হাঁটা প্রভৃতি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে অর্থাৎ নারীর আচরণিক সব কিছুই শিশুকাল থেকে নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতের জন্যে তার জীবনে নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। আবার দুর্ভাগ্য যাতে না আসে তাই তাকে শিক্ষা দেওয়া হয় কপালে হাত না দিয়ে বসার। এর অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যতে তার দুর্ভাগ্যের কারণ হবে তার অসংযত আচরণ।

খ) আমাদের এ অঞ্চলের প্রতিবেশে বাল্যবিবাহ প্রথা খুবই স্বাভাবিক একটি সামাজিক চিত্র। একটি কন্যা শিশু জন্মের পর থেকেই বিবাহের প্রথা পালনে তাকে প্রস্তুত করা হয়। এজন্যে দেখা যাচ্ছে, রীতি পালনেও অবিবাহিত নারীর দেরিতে বিয়ে না হওয়ার (উপাত্তঃ ১) সমাধান হিসেবে রাতে আয়না দেখা থেকে বিরত থাকার ট্যাবুর প্রচলন রয়েছে।

গ) সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে মেয়ে সন্তান যাতে না হয় তারও কিছু সতর্কতামূলক রীতিপালন (উপাত্তঃ ৪, ১১, ২১) বা ধারণার ব্যবহার দেখা যায়। অবিবাহিত নারী বাড়ির তৈরি প্রথম পিঠা খাওয়া, খাবার পর বাসন চেটে খাওয়া, হাঁড়িতে ভাত নিয়ে খাওয়ার রীতি নিষিদ্ধ। এ রীতি মেনে না চললে ভবিষ্যতে তার কন্যা সন্তান হতে পারে। অর্থাৎ আমাদের সমাজে কন্যা শিশুর জন্মের বিষয়টি নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে।

ঘ) প্রবন্ধে উপস্থাপিত উপাত্তগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলা অঞ্চলে নারীর বৈবাহিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে সাধারণত নীতি নির্ধারণের প্রয়াস অধিক। অর্থাৎ আমাদের সমাজে নারীর বিবাহ এবং বিবাহ পরবর্তী জীবনকাল তার জন্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রথা পালনের সময়। বিবাহিত নারীর সকল আচরণ আবর্তিত হয় স্বামীর মঙ্গল কামনায় (উপাত্তঃ ৫, ৯, ১০, ১৩)। এ সকল রীতি পালনে ব্যত্যয় ঘটলে স্বামীর অমঙ্গল বা ক্ষতি হতে পারে বলে মনে করা হয়ে থাকে। যেমন- স্বামীর মঙ্গলার্থে বিবাহিত নারীর নাকফুল ও চুড়ি পরিধান, শাঁখা-সিঁদুর পরিধান আবার নতুন কাপড় পরে পেছনে না তাকানো বা নাকফুল না-হারানো প্রভৃতি ট্যাবু পরিলক্ষিত হয়।

ঙ) বিবাহিত নারী রীতি না-মানলে বা সচেতন না-হলে স্বামীর বহুবিবাহ (উপাত্তঃ ৬, ৭) হবার সম্ভাবনা স্বাভাবিক বলে গণ্য করা হয়। আমাদের দেশে এক স্ত্রী নিয়ে সংসার করার সময় পুরুষের

পুনরায় বিবাহকে সাধারণ বিষয় হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। এ জন্যে রীতি পালন না-করলে 'সতীন ঘরে আসবে' জাতীয় ধারণার প্রচলন দেখা যায়।

চ) নারীর সন্তান ধারণ ক্ষমতাও (উপাত্তঃ ২, ২৪) সাংস্কৃতিক রীতি পালনের ওপর নির্ভর করে। ছোট বেলায় কন্যা শিশুর খুন্তির বাড়ি বা নারীর হাঁড়ির প্রথম ভাত বা পিঠা খাওয়া নিষিদ্ধ। এ রীতি পালন না-করলে ভবিষ্যতে সন্তান ধারণে অক্ষম হয়ে যাবেন জাতীয় ধারণার প্রচলন সমাজে লক্ষ করা যায়।

ছ) সন্তানসম্ভবা নারীর ক্ষেত্রে তার অনাগত ভবিষ্যৎ শিশুর নিরাপত্তা ও সুস্থতার দায়ভারও (উপাত্তঃ ৩, ১৪-১৭) নারীর সমাজের রীতি পালনের ওপর নির্ভর করছে। জবাইকৃত হাঁস মুরগির পেটের ডিম খাওয়া বা চন্দ্রসূর্য গ্রহণের সময় খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। আবার বাইরে বের হবার সময় সন্তানের মঙ্গলার্থে আগুন বা লোহা জাতীয় দ্রব্য সাথে রাখার রীতি রয়েছে। আমাদের এ অঞ্চলের প্রতিবেশে সন্তানের প্রতি পুরুষের এ ধরনের রীতি পালনের কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

জ) নিঃসন্তান এবং বৈধব্যের শিকার নারীর উপস্থিতি (উপাত্তঃ ১৮, ১৯) সমাজে অন্য নারীর সৌভাগ্যের পক্ষে অকল্যাণকর বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ নিঃসন্তান বা বিধবা নারীকে সমাজে অমঙ্গলের তকমা দেওয়া হয়। তাই কোনো শুভ কাজে বের হবার সময় বা কেউ নতুন জীবন শুরু করছে এ জাতীয় অনুষ্ঠানে তার পদচারণা নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়, যদিও পুরুষদের ক্ষেত্রে এ জাতীয় কোনো রীতি সমাজে দেখা যায় না।

ঝ) সনাতন ধর্ম পালনকারী বিবাহিত নারী স্বামীর মঙ্গলার্থে শাঁখা-সিঁদুর পরেন তেমনি আজানের সময় ইসলাম ধর্ম পালনকারী নারী মাথায় কাপড় দেন। অর্থাৎ ধর্মীয় রীতি পালনের ক্ষেত্রেও (উপাত্তঃ ১৩, ২৭) নারীর কর্তব্য বা রীতি রয়েছে।

ঞ) স্বামীর মৃত্যু এড়াতে নারীর আচরণকে সংযত করার নির্দেশ পালনের রীতি (উপাত্তঃ ২৬) রয়েছে। অর্থাৎ যদি কোনো নারী ভাঙা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ান তবে ভবিষ্যতে তার স্বামীর মৃত্যুর জন্যে এই রীতি তাকেই দায়ী করে।

ট) নারীর পরিধেয় কাপড়ের ক্ষেত্রে সাদা রংকে পরিহার করার রীতি (উপাত্তঃ ২৮) দেখা যায়। অবিবাহিত বা বিবাহিত নারীদের সাদা রং পরতে নিরুৎসাহিত করা হয়। কারণ এ অঞ্চলের প্রতিবেশে বিধবার পরিধেয় হিসেবে সাদা রঙের শাড়ি অবিবাহিত ও বিবাহিত নারীদের পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে অকল্যাণকর মনে করা হয়।

ঠ) আমাদের সংস্কৃতিতে খাবার সময় সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে, বাড়ির নারীরা বিশেষ করে বিবাহিত নারী খাবার গ্রহণ করেন। নারী আগে খাবার গ্রহণ করলে পরিবারের অকল্যাণ হবার রীতি (উপাত্তঃ ৮) প্রভাবিত চিন্তা এ অঞ্চলের মানুষের আচরণের খুবই প্রচলিত একটি দৃষ্টান্ত। পাশাপাশি বাড়ির পুরুষ যাতে পর্যাপ্ত এবং ভালো খাবার খেতে পারেন সেই দৃষ্টিভঙ্গিও কাজ করে। গৃহস্থালি প্রতিবেশে সমাজের পুরুষের আধিপত্যের এ চিত্রটিও এ রীতি থেকে বোঝা যায়।

ড) সন্তানের সুরক্ষায় অনেক সময় মায়ের খাদ্য গ্রহণ থেকেও বিরত থাকার রীতি (উপাত্তঃ ১২) রয়েছে। কিছু কিছু অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে যে, যার একটি পুত্র সন্তান রয়েছে তিনি যদি রাতে বাঁশির আওয়াজ শোনেন তবে রাতে আহার গ্রহণ করতে পারবেন না, তাহলে সন্তানের ক্ষতি হবে।

ঢ) সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে খাদ্য গ্রহণে সামাজিক বিধি নিষেধ (উপাত্তঃ ২২) পালন দেখা যায়। সাংস্কৃতিক ট্যাবু প্রভাবিত ধারণা থেকে মনে করা হয়, নারী জোড়া কলা খেলে জমজ সন্তান প্রসব করবেন। জমজ সন্তান জন্মদানে মায়ের জন্যে কঠিন পরিস্থিতি এড়াতে এ জাতীয় রীতি মেনে চলার রেওয়াজ দেখা যায়।

ত) বাঙালি নারীদের লম্বা কেশ সৌন্দর্যের মাপ কাঠি হিসেবে ধরা হয়। সেক্ষেত্রেও নারীর রীতি (উপাত্তঃ ২০) পালন করার সুযোগ রয়েছে। যথা– বাঁশ গাছের নিচে চুল রেখে দিলে চুল বাঁশের মতন লম্বা হবে।

থ) বাঙালি নারীর গৃহস্থালি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অবাচনিক সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, নিষেধ লক্ষণীয়-

১) শিশুর নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ রক্ষা মায়ের রীতি পালনের (উপাত্তঃ ২৯, ৩০, ৩১) ওপর নির্ভর করে। যথা-শিশুকে অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচাতে কপালে কালো টিপ দেয়া, কান ফুঁড়িয়ে দেওয়া, শিশুর সাথে লোহা জাতীয় দ্রব্য রাখা।

২) রীতি মেনে খাদ্য পরিবেশনের (উপাত্তঃ ৪৩-৪৬) দায়িত্বও নারীর। যেমন– কেউ পানি চাইলে সাথে কিছু খেতে দেওয়া, একবার না খাইয়ে আরেকবার খাবার মুখে তুলে দেওয়া অন্যথায় অমঙ্গল হবার আশঙ্কা দেখা হয়।

৩) পরিবারে মঙ্গলার্থে রীতি মেনে সবার নতুন কাপড় পরা থেকে (উপাত্তঃ ৩৮, ৫০) পুরনো কাপড় সেলাই করার দায়িত্ব পালনও নারী করে থাকেন। যেমন– নতুন কাপড় পরে আগুনে ছ্যাঁকা নেয়া বা গেঞ্জি, জামা পরে থাকা অবস্থায় সেলাই না করে দেয়া।

৪) সময় ভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা পালনে–

ক. সকাল বেলার রীতির দায়িত্ব (উপাত্তঃ ৩২-৩৪) পালনে নারীকে সচেতন থাকতে হয়। ঘর পরিষ্কার থেকে বাড়ির সবাইকে বাইরে বের হবার আগে খাবার পরিবেশন সঠিক সময়ে না- করলে বাড়ির অমঙ্গল হবার আশঙ্কা কাজ করে, যার সুরক্ষার দায়িত্ব নারীর। পাশাপাশি নারী ঘরের কাজ (উপাত্তঃ ৪২) সাবধানে সম্পন্ন না-করলেও অলক্ষণ ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

খ. দুপুরে ভিক্ষা দিলে গৃহস্থের অন্ন ঘাটতি ঘটে এ জন্যে এই সময়ে ভিক্ষা না দেয়ার রীতি রয়েছে। অর্থাৎ দুপুর বেলার (উপাত্তঃ ৩৫) রীতি পালনের দায়িত্বেও নারী।

গ. সন্ধ্যাবেলায় ঘরে বাতি দিয়ে ঘর পবিত্র করা এবং ঘরের সবার কাপড় (উপাত্তঃ ৩৬, ৩৭, ৪০) বাইরে থেকে আনার রীতি, পাশাপাশি মা এবং তার কন্যা শিশুর চুল খোলা রেখে বাইরে না যাওয়ার রীতি পালন করার দায়িত্বও নারীর।

ঘ. নারীকে রাতের বেলার সাংস্কৃতিক ট্যাবু রীতির (উপাত্তঃ ৩৮, ৪৯) দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন– রাতে ঝাড়ু না দেয়া, ঘরের ময়লা বা রান্নার পরে অবশিষ্ট ময়লা পানি বাইরে না ফেলা প্রভৃতি রীতি পালনে নারী সক্রিয় থাকেন। এ থেকে অনুমেয় যে, আমাদের সমাজে সকাল থেকে শুরু করে রাতের শেষ কাজ পর্যন্ত সংসারের কল্যাণের উদ্দেশ্যে রীতি পালন করেন নারী।

৫.৩ নারীবিষয়ক অভাষিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুর উপাত্তের পর্যালোচনা

একটি অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের নারীর প্রতি মনোভাব এবং আচরণ সেই সমাজ ব্যবস্থার রীতিনীতি, আদর্শের একটি চিত্র উপস্থাপন করে। ব্যক্তি তার প্রতিবেশ লব্ধ বিভিন্ন রীতিনীতি, ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস, সঙ্গদ্বারা প্রভাবিত আচরণিক বহিঃপ্রকাশ করে থাকেন।[২৮] বাঙালি সমাজে নারীর প্রতি আচরণে উপরিউক্ত অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, বহুকাল থেকেই ধর্মীয় বা সামাজিক ভাবেই বেশির ভাগ আদেশ নিষেধ রীতি রেওয়াজ পালনে নারীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কন্যা শিশু, অবিবাহিত, বিবাহিত, সন্তানসম্ভবা, নিঃসন্তান, বিধবা সকল সামাজিক অবস্থানের নারীর প্রতি রীতি পালনের আচরণে বহু যুগের সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক রীতির চর্চার একটি চিত্র অনুধাবন করা যায়। যা কাল পরম্পরায় মানুষের অভিজ্ঞতায় ও আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ইতিবাচক বা নেতিবাচক ধারণাগুলো অভ্যাস হিসেবে গড়ে ওঠে যা ব্যক্তি খুব স্বাভাবিক ভাবেই পালন করতে বাধ্য হয়ে ওঠেন।[২৯] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের সমাজে ছোট থেকেই নারীকে তার আচরণ, যথা– জোরে হাসা, কথা বলা, জোরে হাঁটা, কপালে হাত দিয়ে বসা (উপাত্তঃ ২৩, ২৫, ৪১) নিয়ন্ত্রণ করবার শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে এ জাতীয় ট্যাবু তার অভ্যাসে পরিণত হয়। সাধারণত অভ্যাস প্রবৃত্তির (instincts) মতো কাজ করে।[৩০] তাই পরবর্তীতে এ সকল রীতি পালন একজন নারীর অভ্যাসে পরিণত হয়। নারীকে দমিয়ে রাখতে এ জাতীয় ট্যাবু প্রভাবিত অভ্যাস গড়ে তোলার নেপথ্যে সক্রিয় পুরুষ শাসিত সমাজ অর্থাৎ পুরুষের তৈরি ট্যাবু।

প্রতিবেশগত আচরণ ও প্রচলিত বিভিন্ন রীতি থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।[৩১] এ অঞ্চলের নারীরা যেহেতু বহুকাল ধরে ঘরে অবস্থান করে সংসারের দায়িত্ব পালন করেছেন তাই গৃহস্থালি সংক্রান্ত সকল রীতির দায়ভার যুগযুগ ধরে তারা বহন করে এসেছেন। ঘরের অমঙ্গল রোধে গৃহস্থলি সকল সাংস্কৃতিক ট্যাবু পালনের দায়িত্ব নারীকে করতে দেখা যায়। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত সকল সময়ে (উপাত্তঃ ৩৫-৪০, ৪৯) ঘরের সবার সকল সুরক্ষার দায়িত্ব হতে শুরু করে কাউকে ভিক্ষা বা কিছু ধার দেওয়া, ঘরের পরিবার পরিজনের রীতি অনুযায়ী সবার খাবার পরিবেশন, ঘরের শুদ্ধিকরণের সকল দায়িত্ব নারীর। আমাদের সংস্কৃতিতে অতিথি আপ্যায়নে নারীদের ভূমিকা মুখ্য। এ অঞ্চলে অতিথি সেবা (উপাত্তঃ ৪৬) না হলে গৃহস্থের

অমঙ্গল হবার ধারণা প্রচলিত। অপরিচিত কেউ পানি চাইলে তাকে খাবারসহ পানি দেবার রেওয়াজ (উপাত্তঃ ৪৩) রয়েছে। পাশাপাশি কেউ খাবার দিলে তাকে সেই পাত্র পূর্ণ করে খাবার ফেরত দেওয়ার প্রচলন (উপাত্তঃ ৪৫) আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিবেশে খুব স্বাভাবিক দৃষ্টিতেই দেখা হয়। এ জাতীয় আচরণ ব্যক্তি প্রতিবেশ থেকে শিখে পরবর্তী জীবনে তার নিজের আচরণিক উপস্থাপনায় তা প্রকাশ করে থাকে।[৩২] সাংস্কৃতিক ট্যাবুর রীতি পালনের প্রতি পরিবারে মা, বড় বোন, খালা নানি, ফুফু, দাদি অর্থাৎ অভিভাবকস্থানীয় নারীর আচরণিক প্রকাশ থেকে একজন কন্যা শিশু তার অভ্যাসে এসকল রীতি পালন আয়ত্ত করে নেয়।

খাদ্য গ্রহণে রীতি পালন বিশ্বজনীন খুবই পরিচিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ট্যাবু। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পশিম মালয়শিয়ার ওরাং আসলি (Orang Asli) আদিবাসীর সন্তানসম্ভবা নারীর ছোট প্রাণী যথা, ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, ব্যাঙ, ছোট পাখি ও ছোট মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ যাতে তার মধ্যে কোনো ধরনের দুর্বলতার (weak spirits) জন্ম না হয়। পাপুয়া নিউ গিনির ওনাবাসুলু আদিবাসী (Onabasulu) নারীদের জন্যা তাজা মাংস, কলা এবং লাল রঙের ফল গ্রহণ নিষিদ্ধ কারণ তাদের মাসিক (menstruating) হয়। যদি কোনো ঋতুময়ী নারী তাজা মাছ খান তবে যেই ফাঁদ (trap) দিয়ে মাছ ধরা হয়েছে সেই ফাঁদে আর মাছ উঠবেনা। বয়স্ক নারীর জন্যে মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ এবং গর্ভবতী নারী ডিম খেতে পারবেন না। কিরিউইনা দ্বীপের (Kiriwina Islanders) আদিবাসী নারীর কলা, আম খাওয়া নিষিদ্ধ যাতে অনাগত সন্তান সুস্থ ভাবে জন্ম নিতে পারে। বেনিন এবং ইশান (Benin and Ishan) অঞ্চলে নতুন মায়ের তেল এবং তাজা মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। মধ্য-পশ্চিম নাইজেরিয়ার ইশান, আফেমাই এবং ইসকো (Ishan, Afemai, and Isoko) অঞ্চলের সন্তানসম্ভবা নারীর শামুক এবং আসাবা (Asaba) অঞ্চলে ডিম এবং দুধ গ্রহণ নিষিদ্ধ কারণ এসব অঞ্চলের মানুষ মনে করেন এ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করলে জন্মের পর সন্তানের খারাপ অভ্যাস গড়ে ওঠে।[৩৩] বাংলাদেশের প্রতিবেশ প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, (উপাত্তঃ ৪, ৮, ১১, ১৬, ২১, ২২) অবিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে বাড়িতে প্রস্তুতকৃত প্রথম পিঠা খাওয়া নিষিদ্ধ, বিবাহিত নারীর পরিবারের সবার শেষে খাদ্য গ্রহণ রীতি, খাবার পরে বাসন চেটে খাওয়া, চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সময় সন্তান-সম্ভবা নারীর খাদ্য গ্রহণ, হাঁড়িতে ভাত খাওয়া বা জোড়া কলা খাওয়া নিষিদ্ধ। খাদ্য গ্রহণে এ জাতীয় খাদ্যাভাসে সতর্কতাজনিত রীতি (উপাত্তঃ ৪, ১১, ২১) পালন বেশির ভাগই সাবধানতা অবলম্বন যাতে নারী কন্যা সন্তানের জন্ম না দেন।

সামাজিক প্রজ্ঞানমূলক (cognition) ধারণায় ছোট থেকেই চারপাশের পরিবেশ হতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং প্রতিবেশ প্রভাবিত চিন্তা, রীতিনীতি, আদেশ নিষেধ আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।[৩৪] সাংস্কৃতিক ট্যাবু রীতি পালনে নিঃসন্তান এবং বিধবা নারীর প্রতি সমাজের মানুষের নির্দয় আচরণিক ধারণা পাওয়া যায়। কন্যা শিশু জন্মকে হতাশাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে দেখার পাশাপাশি তা রোধে রীতি পালনও আমাদের সমাজের নারী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা পাওয়া যায়। সেই প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সমাজে পুরুষ অর্থাৎ ছেলের কদর বেশি। ছেলে সন্তান প্রত্যাশিত,[৩৫] কন্যা শিশুর জন্মগ্রহণ অনাকাঙ্ক্ষিত ও নেতিবাচক ধারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পাশাপাশি কন্যা

জন্ম নেবার দায়ভার এবং তা প্রতিকারও নারীর রীতি (উপাত্ত: ২১) পালনের ওপর নির্ভর করে বলে সমাজে চিহ্নিত। অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু রীতিতে কালো রঙের রূপক উপস্থাপন খুবই চমকপ্রদ কারণ কালোকে অশুভ জ্ঞান করা হয় (উপাত্ত: ৪৭)। গায়ের রঙের ক্ষেত্রেও কালো রঙের প্রতি নেতিবাচক ধারণা পোষণ করা হয়। আবার মা কালো রঙের কাজলের টিপ কপালে লাগিয়ে শিশুকে খারাপ দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে (উপাত্ত: ৪৭) ব্যবহার করেন। অর্থাৎ কালো রঙকে অচ্ছুত জ্ঞান করলেও আবার তা অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। সমাজে রঙের ব্যবহারকে রূপকার্থে ট্যাবু হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে মানুষের ভাবগত উপস্থাপন হলো চারপাশের বিষয়কে রূপকগত ভাবে প্রকাশ করা।[৩৬] একেক সমাজের প্রতিবেশে একেক ধরনের রঙের রূপক উপস্থাপনের ভিন্নতা দেখা যায়, চিনে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে লাল রঙ পরিধান নিষিদ্ধ, বাঙালি নারী বিয়েতে সাধারণত লাল রঙের কাপড় পরিধান করে থাকেন। পাশ্চাত্যে সাদা রংকে শুভ ও পবিত্র জ্ঞানকরে নববধূর পোশাক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রাচ্যের বিশেষ করে বাংলা অঞ্চলের প্রতিবেশে বিধবা নারী ছাড়া সকল নারীকে সাদা রং পরিহার করার রীতির (উপাত্ত: ২৮) প্রচলন দেখা যায়।

সামাজিক বা ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি থেকে বিভিন্ন রীতিনীতি ও নিষেধ দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক অবস্থানও গুরুত্ব বহন করে। সাধারণত শহরে বসবাসরত ব্যক্তির চেয়ে গ্রামে অবস্থানকারী মানুষ এ জাতীয় রীতি পালনে বেশি তৎপর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুসলমান নারীর আজানের সময় মাথায় কাপড় দেওয়া বা সনাতন ধর্মে বিবাহিত নারীর শাঁখা-সিঁদুরের ব্যবহার (উপাত্ত: ১৩, ২৭)। আবার শহরে বা গ্রামেও শিক্ষার আলোতে আলোকিত বা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ধারণালব্ধ ব্যক্তি এ জাতীয় ধারণায় কম প্রাভাবিত হন বা বিশ্বাসী নন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কর্মক্ষেত্রে অংশ নেয়া নারী নতুন কাপড় পরে আগুনে ছ্যাঁকা নেয়া (উপাত্ত: ৪৮), সন্ধ্যায় চুল খোলা রেখে বাইরে যাওয়া (উপাত্ত: ৩৬), অবিবাহিত নারীর রাতের বেলা আয়না না দেখা (উপাত্ত: ১) বা বিয়ের অনুষ্ঠানে নিঃসন্তান বা বিধবা নারীর উপস্থিতির (উপাত্ত: ১৮,১৯) ধারণার সাথে মঙ্গল-অমঙ্গলের সম্পর্ক নেই। মূলত সাংস্কৃতিক ট্যাবু প্রাচীন ধ্যান ধারণা, ধর্মীয় বা সামাজিক নীতি নির্দেশ দ্বারা প্রভাবিত। সমাজে নারীরা পুরুষের তুলনায় রীতি পালনে বেশি আগ্রহী। সমাজের পুরুষ এমনকি নারীরাও আশা করেন যে প্রথা পালনের মাধ্যমে নারীরাই পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্ব নেবেন।[৩৭] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বামীর মঙ্গল কামনায় শাঁখা, সিঁদুর, নাকফুল, হাতে চুড়ি পরিধান করা আবার সাদা রঙের কাপড় (উপাত্ত: ৫, ৯, ১০, ১৩, ২৬, ২৮) পরিধান না করা। গৃহের ও পরিবারের মঙ্গলার্থে (উপাত্ত: ২৯-৩৯) সকল রীতি পালনের দায়িত্ব নারীদের ওপর নির্ভর করে। পাপুয়া নিউগিনির ওনাবাসুলু আদিবাসী (Onabasulu) নারীদের মাসিকের সময় বাড়ির পরিবেশের মঙ্গলার্থে বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে অবস্থান করতে হয় এবং খাদ্য রান্না করে স্বামীকে পরিবেশন নিষিদ্ধ। এ রীতি পালন না করলে স্বামী অসুস্থ এমনকি মৃত্যুও হতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করেন।[৩৮] অর্থাৎ সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবিত বিধি নিষেধগুলো যা পরবর্তী সময়ের সাংস্কৃতিক ট্যাবু তা পালনে জীবনাচরণে ইতিবাচক সৌভাগ্যের[৩৯] প্রভাব দেখা যাবে। বাংলা ভাষায় প্রচলিত অভাষিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুর প্রতি এ

অঞ্চলের মানুষের বর্তমান আচরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পূর্বে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবে অনেকে এসকল ধারণা তাদের দৈনন্দিন অভ্যাসে রপ্ত করে থাকলেও, বর্তমানে সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় ধারণাগুলো সম্পর্কে বেশির ভাগ মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা নেই। শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে নতুন প্রজন্মের বেরিয়ে আসার চেষ্টা থেকে মূলত এ জাতীয় রীতির গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায়।[৪০] সর্বস্তরে নারীর অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজন অসাম্প্রদায়িক বিজ্ঞানমনস্ক ও মানবতাবোধ সম্পন্ন নতুন প্রজন্মের দৃঢ় অবস্থান।[৪১]

উপসংহার

মানুষ ছোটবেলা থেকে অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু ধারণা তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অভিজ্ঞতা লাভের পাশাপাশি আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। বিজ্ঞানসম্মত ধারণা থেকে নয় বরং বিশ্বাস এবং সামাজিক নীতি-রীতি পালনে এর প্রভাব দেখা যায়। ইতিবাচক অর্থাৎ ভবিষ্যতের সৌভাগ্য বা নেতিবাচক দুর্ভাগ্য এড়ানোর চেষ্টায় সমাজে এ জাতীয় ট্যাবু পালন করা হয়ে থাকে। আলোচ্য প্রবন্ধে এ অঞ্চলের মানুষের আচরণে নারী সংক্রান্ত আবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু ও এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ প্রভাবিত আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উপস্থাপিত উপাত্ত এবং তা বিশ্লেষণে নারীর প্রতি আমাদের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির একটি ধারণা পাওয়া যায়। সংসারের মঙ্গলার্থে নারীকে শিশুকাল থেকেই প্রস্তুত করা হয় সামাজিক বিধি-নীতি-রীতি পালনের। পাশাপাশি পুরুষ শাসিত সমাজের একটি চিত্রও এতে ফুটে উঠেছে। তবে বর্তমান যুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে নারী বিষয়ক অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু প্রভাবিত নীতি-নির্দেশ মেনে চলার প্রবণতা অনেক কমে গেছে। বাংলা অঞ্চলের অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ; পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিস্তৃত পরিসরে গবেষণাধর্মী কাজের সুযোগ রয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১ মুহাম্মদ আবদুল হাই, *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা*, সম্পা: হুমায়ুন আজাদ, ১৯৯৪, মুহাম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৯, পৃ. ২৯৯

২ Chunming Gao, *A Sociolinguistic Study of English Taboo Language*, Theory and Practice in Language Studies, 2013, pp. 312

৩ Peirong Fu, *Philosophy and Human Life*, Beijing, Renmin University of China Press, 2006

৪ A. Judith Knapp, L. Mark & Hall, *Nonverbal Communication in Human Interaction*, Boston: Wadsworth, 2010

৫ পূর্বোক্ত, A. Judith Knapp, L. Mark & Hall, 2010

৬ Nada Qanbar, *A Sociolinguistic Study of the Linguistic Taboo in the Yemeni Society*, MJAL3: Summer, 2011

৭ Helen Goodluck, *Language Acquisition: A Linguistic Introduction*, London: Blackwell, 1991

৮ পূর্বোক্ত, মুহাম্মদ আবদুল হাই, ১৯৫৯

৯ A. Dickinson, *Actions and Habits: the Development of Behavioural Autonomy,* Philos, Trans, R. Soc, *B Biol, Sci.,* Vol. 308, 1985, pp. 67-78

১০ J. Holmes, *An Introduction to Sociolinguistics*, Longman: London and New York, 1992

১১ S. Epstein, *Demystifying Intuition: What it is, what it does, and how it does it,* Psychological Inquiry, Vol. 21, 2010, pp. 295-312

১২ Lola Yulchiboeva Kalandarovna, Origin and concept of taboo vocabulary, *Innovative Technologica: Methodical Research Journal,* Vol. 3, No. 10, 2022, pp. 184-19033

১৩ পূর্বোক্ত, Helen Goodluck, 1991

১৪ পূর্বোক্ত, Nada Qanbar, 2011

১৫ Farzad Sharifian, *Cultural linguistics and intercultural communication*, In: Language and Intercultural Communication in the New Era, Ed. by F. Sharifian, M. Jamarani, New York, Routledge, 2013, pp. 60-79.

১৬ S. E. Taylor, Adjustment to threatening events: A theory of cognitive adoptation, American Psychologist, Vol. 38, 1983, pp. 1161-1173

১৭ D. H. Schunk, Social cognitive theory, APA educational psychology handbook, Vol. 1, Theories, constructs, and critical issues, American Psychological Association, USA, 2012, pp. 101–123,

১৮ Sekhar Shandra Rao, Cognitive Linguistics: An Approach to the Study of Language and Thought, *Journal for Research Scholars and Professionals of English Language Teaching,* Vol. 5, No. 24, 2021

১৯ Javier Bernacer and Jose Ignasio Murillo, The Aristotelian conception of habit and its contribution to human neuroscience, Frontiers in Human Neuroscience, Vol. 8, No. 883, 2014

২০ Vyvyan Evans and Melanie Green, *Cognitive Linguistics an introduction*, Edinbrugh University Press, 2006

২১ Svenja Caspers *et al*., Moral concepts set decision strategies to abstract values, PLoS ONE, Vol. 6, No. 4, e18451, 2011

২২ Friedrich Ungerer and Hans-Jorg Schmid, *An introduction to cognitive linguistics*, Addison Wesley Longman Limited, UK, 1996

২৩ নাদিয়া নন্দিতা ইসলাম, সমাজভাষিক সংজ্ঞাপনে সন্তোষ–শর্ত পূরণের ভূমিকা বিশ্লেষণ: প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা*, খণ্ড ১৩, সংখ্যা ২৫-২৬ (যুক্ত), ২০২১

২৪ Luiz Pessoa, *The cognitive-emotional brain*, Cambridge, MA: MIT Press, 2013

২৫ Carol Seger and Brain Spiering, A critical review of habit learning and the basal ganglia, *Front in System Neuroscience*, Vol. 5, No. 66, 2011

২৬ Albert, Bandura, Human agency in social cognitive theory, *American Psychologist*, Vol. 44, No. 9, 1989, pp. 1175-1184

২৭ Albert, Bandura, Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change, *Psychological Review,* Vol. 84, No. 2, 1977, pp. 191-215

২৮ পূর্বোক্ত, Helen Goodluck, 1991

২৯ পূর্বোক্ত, Svenja Caspers *et al.,* 2011

৩০ পূর্বোক্ত, Vyvyan Evans and Melanie Green, *Cognitive Linguistics an introduction*, Edinbrugh University press, 2006

৩১ পূর্বোক্ত, Friedrich Ungerer and Hans-Jorg Schmid, *An introduction to cognitive linguistics*, Addison Wesley Longman Limited, UK, 1996

৩২ পূর্বোক্ত, Nada Qanbar, 2011

৩৩ Victor Benno Meyer Rochow, Food taboos: their origins and purposes, *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine,* Vol. 5, No. 1, 2009

৩৪ পূর্বোক্ত, Carol Seger and Brain Spiering, Front in System Neuroscience, Vol. 5, No. 66, 2011

৩৫ সৌরভ সিকদার ও সালমা নাসরীন, *বাংলা ভাষায় নারী শব্দাভিধান, গবেষণা ও সংকলন*, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯

৩৬ হাকিম আরিফ, *বাংলা অবাচনিক যোগাযোগ*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ২০১৫

৩৭ Sachiko Ide, *Japanese Sociolinguistics Politeness and Women's Language*, Lingua 57, North Holand Publishing Company, 1982, pp. 357-385

৩৮ পূর্বোক্ত, Victor Benno Meyer Rochow, 2009

৩৯ পূর্বোক্ত, Chunming Gao, 2013

৪০ Laura P. Otis and James E. Alcock, Factors affecting extraordinary belief, *The Journal of Social Psychology,* 1982, Vol. 118, pp. 77-85

৪১ সৌরভ সিকদার, *বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিবর্তন*, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৯